আফিয়া সিদ্দিকী

গ্রে লেডি অব বাগরাম

সংকলন

টিম প্রজন্ম

অনুবাদ ও সম্পাদনা

আফিয়া মুভমেন্ট বাংলা

মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা...
৪১৬ (৪র্থ তলা) কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৫৭২০ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

আফিয়া সিদ্দিকী

গ্রে লেডি অব বাগরাম

প্রকাশকাল

মে ২০১৯

প্রচ্ছদ

ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক

আমাদেরবই.কম

০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

অনলাইন পরিবেশক

Rokomari.com
Boibazar.com
Eksathei.com
shobdaloy.com
Pothikshop.com
Tariqzone.com
AmaderBoi.com
Ruhamashop.com
Alfurqanshop.com
Islamicboighor.com
Niyamahshop.com
Boisomahar.com
islamiboi.net
Wafilife.com
Sijdah.com
Boipark.com
Kitabghor.com
Ittadishop.com

সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য: ২২০ টাকা

Afia Siddique: The Gray Lady of Baghram

Published by Projonmo Publication

Price: 220 Taka, 10 US$

ISBN: 978-984-34-6698-3

প্রকাশকের কথা

‘গ্লোবাল রিসার্চ: সেন্টার ফর রিসার্চ অন গ্লোবালাইজেশন’ থেকে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয় ১৯৪৫-২০১৮ সাল পর্যন্ত আমেরিকার হাতে নিহতের সংখ্যা ২০ মিলিয়নেরও বেশি! কয়েক বছর ধরে গবেষণা করে রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছেন মার্কিন ইতিহাসবিদ জেমস এ লুকাস। রিপোর্টটিতে বলা হয় ২০-৩০ মিলিয়ন মানুষ নিহত এবং নিহত প্রতিজনের বিপরীতে ১০ জন আহত হয়েছে। চিকিৎসকদের কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংগঠন আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে যেটাতে দেখা যায় ২০০৪ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধে ১৩ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে! তথাকথিত মানবতার ফেরিওয়ালাদের হাত কতটা রক্তাক্ত এই দু’টি রিপোর্ট থেকেই এটি স্পষ্ট বুঝা যায়।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তথাকথিত যুদ্ধের নামে শত শত মানুষের উপরে ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে’র নামে চলা এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার ড. আফিয়া সিদ্দিকী যিনি আমেরিকাতেই উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন। তিন সন্তানের জননী আফিয়া সিদ্দিকীকে অপহরণ করে দীর্ঘ পাঁচ বছর গুম করে রেখে অবশেষে আটকের কথা স্বীকার করা হয় ২০০৮ সালে। ন্যায়বিচার এমনকি নূন্যতম মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এক নারীকে ৭ বছর ধরে সীমাহীন নিপীড়ন ও নির্যাতনের পরে ২০১০ সালে ইউএস ফেডারেল কোর্টে তার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করা হয়। বিচারের নামে সেই প্রহসনে ৩৮ বছর বয়সী আফিয়াকে ৮৬ বছর কারাদন্ড দেওয়া হয়। ক্যাঙ্গারু কোর্টের এই রায় প্রমাণ করে ‘যুক্তরাষ্ট্রে ন্যায়বিচার এক দূর্লভ বস্তু’।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আফিয়ার জীবনী, অপহরণ, গ্রেফতার নাটক, মামলা ও বর্তমান অবস্থার উপর লেখা। এই বইটির বেশির ভাগ তথ্য আফিয়া সিদ্দিকী: আদার ভয়সেস, পায়াম-ই-হায়া, মুসলিমম্যাটারস ডট অর্গ,

আফিয়া মুভমেন্ট ডট কম, আফিয়া ডট অর্গ থেকে নেওয়া। বিভিন্ন বই ও ওয়েবসাইট থেকে সংকলন করার মতো একটি দূরুহ কাজ সম্পূর্ন করায় টিম প্রজন্মের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ ছাড়াও আফিয়া মুভমেন্ট বাংলার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা অনুবাদের কাজটা এগিয়ে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা কভার ডিজাইন থেকে বাইন্ডিং পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের।

আশা করি 'আফিয়া সিদ্দিকী: গ্রে লেডি অব বাগরাম' বইটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনে আফিয়া সিদ্দিকীর পরিচয় এবং সকল ঘটনা পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি নতুন করে দু'টি জাতি ও দু'টি দেশের মুখোশ উন্মোচনে ভূমিকা রাখবে।

পরিচালক,
প্রজন্ম পাবলিকেশন

সূচিপত্র

একনজরে আফিয়া সিদ্দিকী

আফিয়া ও তার পরিবার

আফিয়া সিদ্দিকী ১৯৭২ সালের ২রা মার্চ পাকিস্তানের করাচি শহরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মুহাম্মদ সালেহ সিদ্দিকী ছিলেন ব্রিটিশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিউরোসার্জন। মা ইসমাত সিদ্দিকী বিশিষ্ট সমাজকর্মী। তিন ভাইবোনের মধ্যে আফিয়া সর্বকনিষ্ঠ। বড় ভাই মুহাম্মদ সিদ্দিকী একজন আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার। বড় বোন ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী হার্ভার্ড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ। আফিয়া সিদ্দিকীর শৈশবকাল কাটে আফ্রিকার দেশ জাম্বিয়াতে। ৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। এরপর পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শেষ করেন। আফিয়া সিদ্দিকী পবিত্র কুরআন হিফজ করেন। একইভাবে বাইবেল আর তোরাহও (খ্রিষ্টীয়ধর্মগ্রন্থ) পড়েছিলেন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে অগাধ জ্ঞানের জন্য আফিয়াকে তার বোন ‘তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের এনসাইক্লোপিডিয়া’ বলে ডাকতেন।

আমেরিকায় গমন

১৯৯০ সালে আফিয়া সিদ্দিকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার ভাই মুহাম্মদ সিদ্দিকীর কাছে যান এবং টেক্সাসের হাউস্টন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। হাউস্টনে তৃতীয় সেমিষ্টারে থাকাবস্থায় ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (MIT) থেকে ফুল স্কলারশীপ পেয়ে সেখানে ভর্তি হন। ১৯৯২ সালে আফিয়া সিদ্দিকী Islamization in Pakistan & its Effect on Women বিষয়ে গবেষণা করে CARROL L. WILSON AWARD অর্জন করেন এবং পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার পান। ১৯৯৩ সালে আফিয়া সিদ্দিকী ক্যামব্রিজ এলিমেন্টারি স্কুল প্রাঙ্গণে ‘সিটি ডেজ’ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশ নিয়ে ১২০০ ডলার পুরস্কার জেতেন।

গ্রাজুয়েশন ও পিএইচ.ডি. লাভ

আফিয়া সিদ্দিকী ১৯৯৫ সালে এমআইটি থেকে বায়োলজিতে বিএস ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি ব্র্যান্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানীয় স্নায়ুবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ব্র্যান্ডিজ থেকেই ২০০১ সালে পিএইচ.ডি. করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল ‘অনুকরণের মাধ্যমে শেখা’। আফিয়া সিদ্দিকী প্রফেসর নোয়াম চমস্কির তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা করেন। প্রফেসর নোয়াম চমস্কি তার সম্পর্কে বলেন, “আফিয়া যেখানেই যাবে সেখানের পরিবেশকেই পাল্টে দেবে।”

দাতব্য ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহন

ড. আফিয়া বসনিয়ার মজলুম নারী ও শিশুদের জন্য একাই এক হাজার ডলার জমা করেন যা সম্ভবত কোনো ছাত্রীর পক্ষ থেকে ফান্ড গঠনের বিশ্ব রেকর্ড ছিল। শত শত বসনিয়ান এতিমকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি

আমেরিকায় খুঁজে খুঁজে মুসলিম পরিবার বের করেছেন। তিনি কাশ্মীরের মুসলমানদের জন্যও এক লক্ষ রুপি জমা করেন। আফিয়া ভদ্রতা ও চারিত্রিক মাধুর্যতার জন্য সকল শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রিয় ছিলেন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকেই দানের হাত প্রশস্ত করেন।

কোমল হৃদয়ের অধিকারী ড. আফিয়ার ঘরের অনর্থক পশু-পাখির প্রতিও ছিল সীমাহীন ভালোবাসা। তিনি চড়ুই পাখির বাচ্চাকে মৃত্যুবরণ করতে দেখলেও কষ্ট পেতেন। বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি তার ছিল বিশেষ অনুরাগ। আমেরিকায় গিয়েও আফিয়া প্রায়ই বৃদ্ধাশ্রমে যেতেন। বয়স্ক মহিলাদের দেখাশোনা করতেন, গোসল করিয়ে দিতেন, চুল আঁচড়ে দিতেন। কখনো কখনো মানসিক রোগীদেরও সেবা করতে যেতেন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে। তার বোন জিজ্ঞেস করেছিলেন এসব প্রতিবন্ধী শিশুর সেবা সে কেন করে, যারা কিনা বিনিময়ে একটা ধন্যবাদও দিতে পারবে না। এদিকে আশ্রমের বৃদ্ধারা অনেকেই তো আরও অকৃতজ্ঞ। পারলে অভিশাপ দেবে। আফিয়া বলেছিল কৃতজ্ঞ লোকের জন্য তো সেবা করার মানুষের অভাব নেই। এই দুর্ভাগা মানুষগুলো কারো কোনো সুনজর থেকে বঞ্চিত। এজন্য আমি তাদের সেবাই করি।

ইসলাম প্রচার

আফিয়া সিদ্দিকী পবিত্র কুরআনের হাফেজা ছিলেন। ইসলামের প্রতি ছিল সীমাহীন ভালোবাসা। তিনি মনে করতেন আমেরিকার সাধারণ মানুষ শান্তির প্রত্যাশায় জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে। সুতরাং মুসলমানদের দায়িত্ব হলো তাদের কুরআনের পথ দেখানো। তিনি বলতেন, আমেরিকা আমাকে জাগতিক শিক্ষা দিয়েছে আর আমি আমেরিকার জনগণকে ইসলামের শিক্ষা দেবো। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ সালে ড. আফিয়া তার বোন ড. ফাওজিয়াকে সাথে নিয়ে ইনিস্টিউট অফ ইসলামিক রিসার্চ এন্ড টিচিং প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। এই ইনিস্টিউটে কুরআনের দাওয়াতকে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বক্তৃতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ড. আফিয়া হাজার হাজার কপি কুরআন বিতরণ করেছেন। বিশেষভাবে কারাগারে অবস্থানরত বন্দিদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন এবং কুরআন বিতরণ করেছেন। মার্কিন গবেষক ও স্কলার স্টিফেন ল্যান্ডমিন বলেন, "ড. আফিয়া সিদ্দিকীর অপরাধ শুধু একটিই সেটা হলো, সে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ইসলামের প্রচার-প্রসার করেছিলেন।"

বিয়ে ও সন্তান জন্মদান

১৯৯৫ সালে পারিবারিক সিদ্ধান্তে অ্যানেসথিসিয়াবিদ আমজাদ মোহাম্মাদ খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন ড. আফিয়া। এরপর যথাক্রমে আহমেদ (১৯৯৬), মারিয়াম (১৯৯৮) এবং সুলাইমান (২০০২) নামে তিন সন্তান জন্মদান করেন।

পাকিস্তানে ফিরে আসা এবং বিচ্ছেদ

আফিয়া সিদ্দিকীর সাথে আমজাদ খানের সম্পর্ক খুব ভালো যাচ্ছিল না। ২০০২ সালে তৃতীয় সন্তান সুলাইমান জন্মের আগ মুহূর্তে সেটা প্রকট আকার ধারন করে। আফিয়া তার সন্তানদের নিয়ে আমেরিকা থেকে পাকিস্তানে ফিরে আসেন। একই বছর তার বাবা মুহাম্মদ সালেহ সিদ্দিকী হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। একজন প্রতক্ষ্যদর্শী দাবি করেন, আমজাদ খান আফিয়ার বাবাকে ধাক্কা দিলে তিনি পড়ে যান এবং হার্ট অ্যাটাক করেন। কিছু দিন পরে আমজাদ খানের সাথে আফিয়ার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

এডুকেশন সিটি গড়ার পরিকল্পনা

ড. আফিয়া দেশের দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থাকে সকল সমস্যার মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন। আফিয়া মনে করতেন, যদি নতুন প্রজন্মকে উচ্চশিক্ষা দিয়ে সজ্জিত করা যায় অর্থাৎ শিক্ষাকে সহজলভ্য করা যায় তাহলে এই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন। ২০০২ সালে সরকারের নিকট করাচির পার্শ্ববর্তী এলাকায় হামদর্দ ইউনিভার্সিটির সন্নিকটে শিক্ষানগরী *(Education City)* প্রতিষ্ঠার জন্য জমি বরাদ্ধের আবেদন করেন। যা অনুমোদনও পেয়েছিল। তিনি সারা বিশ্বের সকল মুসলিম শিক্ষাবিদদেরকে সেই স্থানে একত্রিত করে একটি আদর্শ শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। যেখানে তরুণ প্রজন্ম গোটা পৃথিবীর আধুনিক ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

অপহরণ

২০০৩ সালের ৩১ মার্চ ড. আফিয়া তার তিন সন্তান, ছয় বছর বয়সী আমেরিকার নাগরিক আহমেদ, চার বছর বয়সী আমেরিকার নাগরিক মারিয়াম এবং ছয় মাস বয়সী সুলাইমান সহ পাকিস্তানের করাচিতে আইএসআই কর্তৃক অপহৃত হন। ৩১ মার্চ ২০০৩ সালে গণমাধ্যমে প্রচারিত হয় যে, আফিয়াকে গ্রেফতার করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। *NBC Nightly News* সহ অন্যান্য সংবাদমাধ্যম এর সত্যতা নিশ্চিত করে। অপহরণের পর ড. আফিয়ার মায়ের সাথে সন্দেহভাজন এজেন্সি যোগাযোগ করে। তারা হুমকি দেয়, আফিয়াকে জীবিত ফেরত পেতে চাইলে তার পরিবার যেন মুখ বন্ধ রাখে।

আফগানিস্তানে সন্ধান এবং নাটক

২০০৮ সালের মধ্যে অনেকের মনে এ ধারণা জন্মে যে, নিখোঁজ হওয়ার পাঁচ বছর পর হয়তো আফিয়া এবং তার সন্তানেরা আর বেঁচে নেই। এরপর ২০০৮ সালের জুলাই মাসে ড. আফিয়া নাটকীয়ভাবে গজনীতে 'আবির্ভূত' হন। তখন ব্রিটিশ মানবাধিকার ও সংবাদকর্মী ইভন রিডলি এবং বাগরামের সাবেক কারাবন্দি, ব্রিটিশ নাগরিক মোয়াজ্জেম বেগ জনসম্মুখে বাগরাম কারাগারে বন্দি এক নারীর প্রসঙ্গ তুলে আনেন। চিৎকার করে কান্না করা সেই বন্দিনীর নাম তারা রেখেছিলেন 'গ্রে লেডি অব বাগরাম' বা 'বাগরামের ধূসর মহিলা'। মার্কিন কর্তৃপক্ষ আফিয়াকে নিয়ে একটি নাটক সাজায়। বলা হয়, "আফগান বাহিনী আফিয়াকে গ্রেফতার করে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মার্কিন সেনারা আফিয়াকে রাখা সেই কক্ষে প্রবেশ করে। এক সৈনিক তার M-4 রাইফেলটি মেঝেতে রাখলে আফিয়া সেটি তুলে নিয়েই চিৎকার করে ওঠে এবং গুলি চালায়। সে সময় আত্মরক্ষার্থে আফিয়ার উপর গুলি চালায় এক মার্কিন সৈন্য।" যদিও পরবর্তীতে তারা এই দাবির স্বপক্ষে শক্তিশালী কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি।

নির্যাতন

ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ ভয়ানক নির্যাতন চালায়। শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের পাশাপাশি তার ধর্মকেও অবমাননা করা হয়। একাধিকবার গণধর্ষনের শিকার আফিয়াকে কারাবন্দির নূন্যতম অধিকার থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়। তার আইনজীবীর তথ্যানুযায়ী নির্যাতনে তার ব্রেইন ড্যামেজ হয়ে যায়। মার্কিনীরা তার দেহ থেকে একটি কিডনিও সরিয়ে ফেলে। অপারেশনের সময় তার অন্ত্রের কিছু অংশ কেটে ফেলা হয় যার কারনে তিনি খাবার হজম করতে পারেন না। গুলিবিদ্ধ ক্ষতের সার্জারি

করতে গিয়ে তার শরীরে প্রলেপের পর প্রলেপ জুড়িয়ে সেলাই করা হয়। অপারেশনের ফলে তার শরীরে অনেকগুলো ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আদালতে তার উপর চালানো ভয়ঙ্কর নির্যাতনের বর্ণনা দেন আফিয়া। আফগানিস্তান থেকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েও তার উপরে নির্যাতন অব্যাহত থাকে। নিউইয়র্ক ডিটেনশন সেন্টারে ছয়জন পুরুষ সৈন্য তাকে জোরপূর্বক উলঙ্গ করে ধূলোবালি ভর্তি কক্ষ থেকে বাহিরে এনে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার ভিডিও ফিল্ম বানানো হয় এবং তাকে বলা হয়, এই ভিডিও ফিল্ম ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া হবে। এভাবে তাকে মানসিক নির্যাতন করে পাগল বানানোর চেষ্টা করা হয়। মার্কিন সরকার ‘সেন্ট্রাল কোর্টে’ আবেদন করে কিছু ছবির প্রচারণা নিষিদ্ধ করেছিল যার মধ্যে আফিয়ার উপরে চালানো নির্যাতনের সেই ছবিগুলোও ছিল। জাতিসংঘ ও জেনেভা কনভেনশনের নিয়ম অনুযায়ী, বেআইনিভাবে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির উপর কোনোপ্রকার অপরাধের স্বীকারোক্তি চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এ ছাড়াও নারীদের সতীত্ব রক্ষা সর্বাবস্থায় জরুরী। চাই তার উপর যে-কোনো অপরাধের অভিযোগ থাকুক। কিন্তু তার বিপরীতে ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে *STRIP SEARCHING* এর নামে পুরুষ সৈন্যদের উপস্থিতিতে উলঙ্গ করা হয়েছে এবং পুরুষ ডাক্তার তাকে তল্লাশি করেছে। সিনেটর মুশাহিদ হুসাইন মিডিয়ায় বলেন, আফিয়ার উপর নির্যাতনে ভয়াবহ এবং বর্ণনাতীত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ড. আফিয়া তাকে জানিয়েছেন, তার উপর মার্কিনীরা ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছে।

মিডিয়া মার্কিন কারাগারগুলোতে নারী বন্দিদের সাথে মানবতা বিধ্বংসী কার্যকলাপের ঘটনা প্রকাশ্যে এনেছে। কারাগারগুলোতে স্ট্রিপ সার্চিং (*STRIP SEARCHING*) এর নামে নারীদের শ্লীলতাহানি, নির্যাতন এবং বাড়াবাড়ি খুবই সাধারণ বিষয়। টেক্সাসের যে কারাগারে ড. আফিয়াকে রাখা হয়েছিল তাকে ‘আতঙ্কের ঘর’ বলা হয়। মার্কিন আদালতে এমন মামলাও বিদ্যমান যার মধ্যে টেক্সাসের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পূর্বেই নারীদেরকে ভয়াবহ নির্যাতনের পর মেরে ফেলা হয়। যেন তারা

কারাগারের বাহিরের বাসিন্দাদেরকে কারাগারে সংঘটিত ভয়াবহ নির্যাতন সম্পর্কে অবহিত করতে না পারে। বাগরাম কারাগারে আফগান, আরব ও পাকিস্তানি নারীদের উপর সংঘটিত নির্যাতনের ঘটনা মার্কিন বাহিনীর আরেক অপরাধনামা।

মার্কিন এর্টনি টিনা ফস্টার ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে করাচির হোটেল রিজেন্ট প্লাজায় মানবাধিকার সেমিনারে বক্তৃতাকালে বলেন, বাগরাম কারাগারে বন্দি নারী, শিশু ও পুরুষের সংখ্যা চার হাজারেরও অধিক। যাদেরকে অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তির নিশানা বানানো হয়েছে। যার মধ্যে শতকরা ৯৮% বন্দিই নির্দোষ। যেখানে মার্কিন প্রশাসন সরকারি হিসাব অনুযায়ী মাত্র ৬০০ জন বন্দি থাকার কথা স্বীকার করেছে। ইরাকের আবু গারীব কারাগারে নারীদের উপর সংঘটিত নির্যাতনের ঘটনা অনেক আগেই মিডিয়ায় এসেছে। মার্কিন সৈন্যরা নারীদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। হাজার হাজার নারী এখনও সিআইএ'র অধিনে প্রতিষ্ঠিত এই কারাগারগুলোতে নির্যাতনের শিকার। বন্দিদের উলঙ্গ ভিডিও বানিয়ে তাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়া সিআইএর অনেকগুলো ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটি। তাদেরকে শুধু শারীরিকভাবেই নয় বরং মানসিক ও চিন্তাগতভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। এমনকি তাদের নূন্যতম মৌলিক অধিকার পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া হয় সেই কারাগারগুলোতে।

অভিযোগ ও মামলা

আফগানিস্তানে আফিয়ার উপর গুলি করার পর ৩রা আগষ্ট ২০০৮ আহতাবস্থায় গ্রেপ্তার করে আমেরিকার নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়। ৪ঠা আগষ্ট ২০০৮ তার বিরুদ্ধে মার্কিন সৈন্যদের উপর আক্রমণের ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করা হয়।

২৭ জুন ২০০৯ পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত হুসাইন হক্কানি ড. আফিয়া সিদ্দিকীর সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ইঙ্গিতে তাকে পুনরায় টেক্সাসের মানসিক কারাগার থেকে নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টার (MDC) তে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তাকে একটি খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয় যার সাইজ ৮×৬×৬। যাতে একটি টয়লেট ও একটি ওয়াশ বেসিন রয়েছে। এই সেলকে স্পেশাল হাউজিং ইউনিট (SHU) বলা হয়। যার সম্মুখে দুইজন পুরুষ গার্ড সর্বক্ষণ পাহারা দেয় এবং প্রতি ২০ মিনিট পরপর সেলের দরজা খুলে ভেতরে আসা-যাওয়া করে। সেখানে কোনো রকম পর্দার ব্যবস্থা নাই। মা ও ভাইয়ের সাথে কথা বলার সময় আফিয়া দাবি করেন, কারা কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান সরকারের ইঙ্গিতেই তাকে নির্যাতন নিপীড়নের লক্ষ্য বানিয়ে রেখেছে যেন তাকে দিয়ে তার 'না করা অপরাধের স্বীকারোক্তি' আদায় করা যায়।

আফিয়ার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হলো আমেরিকান সৈন্যদের হত্যাচেষ্টা। অভিযোগটি যদিও হাস্যকর কারন কথিত সেই 'হত্যাচেষ্টায়' কোনো মার্কিন সৈন্যের গায়ে সামান্য আঁচড়ও লাগেনি অথচ আফিয়ার পেটে দুটো গুলি করা হয়। আরো অবাক করা বিষয় হলো আফিয়ার বিরুদ্ধে আল-কায়েদার সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করা সম্ভব হবে আশঙ্কায় এই বিষয়ে কোনো অভিযোগ করা হয়নি।

পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র

আইএসআই আফিয়াকে তার সন্তানদেরসহ অপহরণ করেছিল এর অসংখ্য প্রমাণ বিভিন্ন সময় মিডিয়াতে এসেছে। অর্থাৎ বিষয়টা এমন নিজ দেশের একজন সম্মানিত নাগরিককে অপহরণ করে আমেরিকার হাতে গোপনে তুলে (বিক্রয়!) দেয় পাকিস্তান। তবে পাকিস্তানি গোয়েন্দাবাহিনীর কাছে এটা নতুন কিছু না। এর আগেও শত শত মানুষকে আমেরিকার কাছে বিক্রি

করে দিয়েছে আইএসআই। যার মধ্যে অন্যতম আলজাজিরার সাংবাদিক সামি আলহায। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় আফিয়া আমেরিকান কারাগারে বন্দি, এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। বিষয়টা জনসাধারনের কাছে আরো পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যখন আমেরিকায় নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত হুসাইন হক্কানীর ষড়যন্ত্র সামনে আসে। হক্কানি মার্কিন উকিল লাজ ফিংককে ড. আফিয়ার জামিন করাতে নিষেধ করেন এবং তাকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে। হুসাইন হক্কানির ইশারায় ড. আফিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন উকিল নিয়োগ দেওয়া হয়, যারা ড. আফিয়ার মুক্তির পরিবর্তে উল্টো মার্কিন সরকারের নিয়োগকৃত উকিলের সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করেছেন। সিনেটর তালহা মাহমুদ, যিনি সেই পাঁচ সিনেটর দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা টেক্সাসের মানসিক কারাগারে ড. আফিয়ার সাথে সাক্ষাত করেছিল। ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০১০ করাচিতে অল পার্টির গোলটেবিল কনফারেন্সে বক্তব্যকালে তালহা প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রেজা গিলানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ড. আফিয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে অন্ধকারে রেখেছে এবং অন্যায় উদাসীনতার প্রমাণ দিয়েছে।

পাকিস্তান সরকার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কখনই ড. আফিয়াকে ফেরত আনার বিষয়ে একনিষ্ঠ ছিল না। কিন্তু ড. আফিয়ার সাহসিকতা ও দৃঢ়তার কারণে সৃষ্টি হওয়া জনগণের প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচার জন্য সরকার সংবাদপত্রে লোক দেখানো বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন এর্টনি টিনা ফস্টার ৬ই মার্চ ২০১০ করাচি সফরকালে হোটেল রিজেন্ট প্লাজায় এক সেমিনারে বলেন, পাকিস্তান সরকার মার্কিন উকিলদের শুধু এজন্য নিয়োগ দিয়েছিল যে, ড. আফিয়াকে যেনো মুক্ত করার পরিবর্তে উল্টো দোষী সাব্যস্ত করা যায়। টিনা ফস্টার আরো বলেন, এই মামলার কোনো আইনী ভিত্তি নেই এবং ড. আফিয়ার উপর আরোপিত অভিযোগগুলো খুব সহজেই ভুল প্রমাণিত করা যেতো। কিন্তু উকিলরা ড. আফিয়ার পক্ষে শক্ত প্রমাণাদিকে ব্যবহারের পরিবর্তে অত্যন্ত হালকা ভূমিকা পালন করেছেন।